প্রথম আলো

কলাম

মতামত

শিক্ষার্থীর শেখা ও স্কুলে অর্থায়ন: বদলের সময় এখন

হোসেন জিল্লুর রহমান
নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি

প্রকাশ: ১০ জুন ২০২৬, ১৯: ২৯

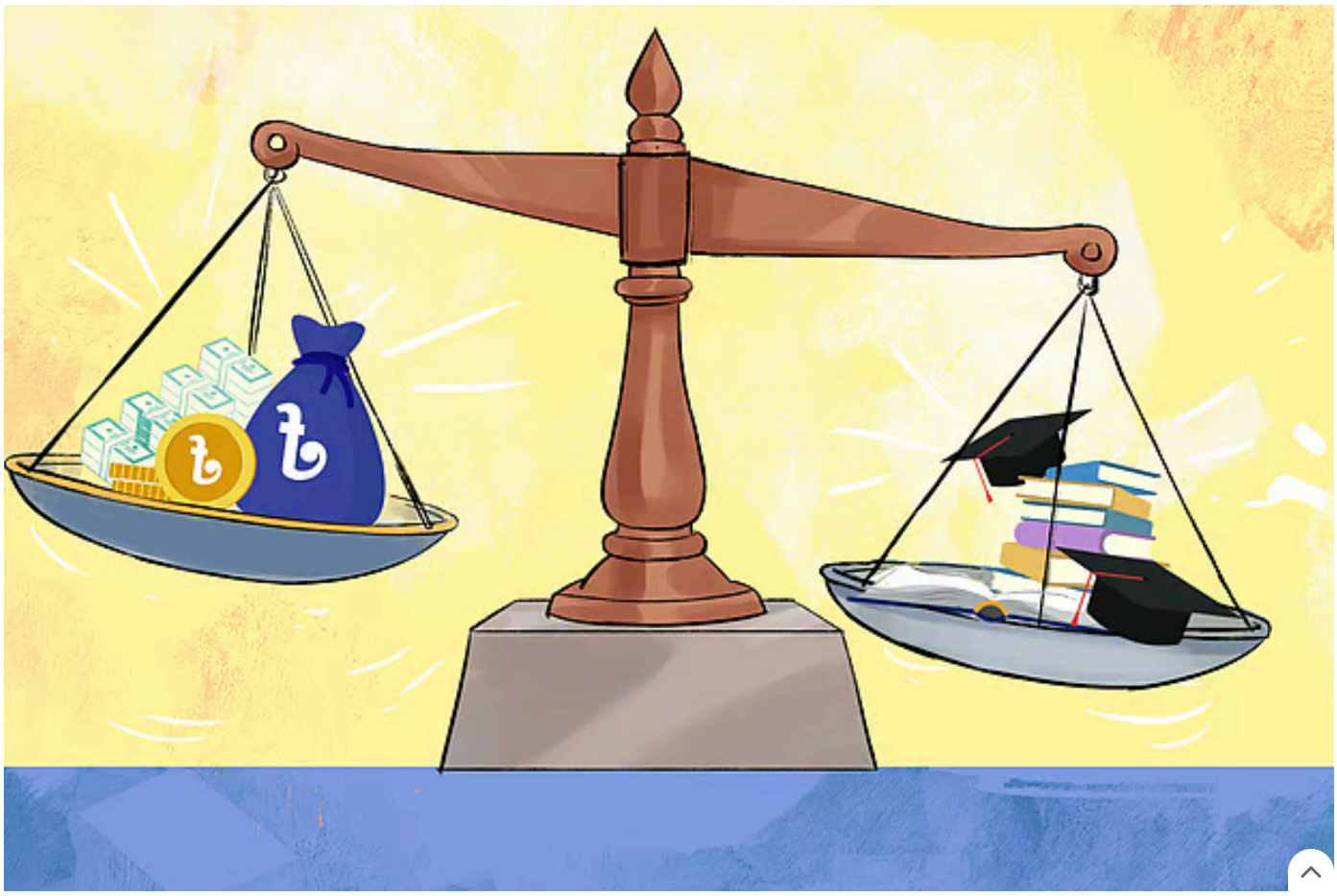

একটা শিশুর মুখের কথা মনে পড়ছে। চট্টগ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম কয়েক বছর আগে। তৃতীয় শ্রেণির এক মেয়ে বলছিল, ‘স্যার, লাইব্রেরিতে গল্পের বই থাকলে আমি প্রতিদিন পড়তাম।’ লাইব্রেরি নেই। গল্পের বই নেই।

স্কুলের জন্য বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় (এসএলআইপি) বরাদ্দ আছে, কিন্তু সেই টাকায় গল্পের বই কেনার নিয়ম নেই। নিয়ম বলছে অন্য কিছু কিনতে। এই একটা গল্পে এসএলআইপির পুরো সংকটের চিত্র আমাদের সামনে চলে আসে। স্কুলকে বলা হয়েছে তোমার উন্নতির পরিকল্পনা করো। কিন্তু কী কিনবে, কতটুকু কিনবে, কীভাবে কিনবে—সবকিছু ঠিক করে দেওয়া হয়েছে ঢাকা থেকে। এটা কি পরিকল্পনা? এটা তো নির্দেশ মেনে চলা।

পিপিআরসির সাম্প্রতিক গবেষণা একটি কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে—বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় আমরা কতটুকু বিনিয়োগ করছি আর তার কতটুকু সত্যিকার শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছাচ্ছে? সংখ্যাটা ছোট নয়। প্রতিবছর এসএলআইপির মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে বরাদ্দ যায়। কিন্তু ভ্যাট কাটে। আয়কর কাটে। পরিবহন খরচ যায়। যা দেওয়া হয়, তার থেকে যা পৌঁছায়—মাঝে একটা বড় ফাঁক। অনেক বিদ্যালয়ে ৩০ হাজার টাকার বরাদ্দের মধ্যে সত্যিকার ব্যবহারযোগ্য টাকা থাকে ২২-২৩ হাজার।

এই ফাঁক পূরণ করার চেষ্টা করেন কে? প্রধান শিক্ষক। তাঁর নিজের পকেট থেকে। এটাকে কোনো ব্যবস্থার স্বাভাবিক চিত্র বলা যায় না। এটা একটা অন্যায্য ব্যবস্থার ছবি। শিক্ষা অর্থনীতির গবেষণা একটি পরিষ্কার সত্য বলে—স্কুলে যাওয়া অর্থের পরিমাণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সেই অর্থ কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং কখন হচ্ছে। হার্ভার্ডের গবেষক এরিক হানুশেক বারবার দেখিয়েছেন, শিক্ষায় বিনিয়োগ তখনই কার্যকর হয়, যখন বিদ্যালয় সেই বিনিয়োগ ব্যবহারে নমনীয়তা পায়। বাংলাদেশে সেই নমনীয়তা নেই।

দুই. এসএলআইপির একটি মূল প্রতিশ্রুতি ছিল—সমাজ যুক্ত হবে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি, সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি—এই কাঠামোগুলো তৈরি হয়েছে। কিন্তু গবেষণা দেখাচ্ছে, এগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। সভা হয়। স্বাক্ষর পড়ে। কিন্তু কেউ জানে না সিদ্ধান্ত কীভাবে হয়, কোথায় হয়। অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা সীমিত। গবেষণায় দেখা গেছে, বেশির ভাগ অভিভাবক জানেনই না এসএলআইপি কী। তারা স্কুলের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু এসএলআইপির সঙ্গে নয়।

এই ব্যবধানটা গুরুতর। কারণ, সত্যিকার সম্প্রদায় অংশগ্রহণ শুধু স্বচ্ছতার প্রশ্ন নয়, এটা গুণগত মান উন্নয়নের প্রশ্নও। যে অভিভাবক জানেন তাঁর সন্তানের স্কুলে কত টাকা আসছে এবং কোথায় খরচ হচ্ছে, তিনি দায়িত্বশীল অংশীদার হতে পারেন। যিনি জানেন না, তিনি কেবল দর্শক। ব্রাজিলে ‘কনসেলহো এসকোলার’ বা স্কুল কাউন্সিলে অভিভাবকেরা সত্যিকার অর্থে বাজেট অগ্রাধিকার ঠিক করেন। ইন্দোনেশিয়ায় বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরিকল্পনা প্রকাশ্যে উপস্থাপিত হয়, সম্প্রদায়ের মতামতে তা সংশোধিত হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের অর্থবহ অংশগ্রহণের পথ এখনো তৈরি হয়নি।

তিন. যে বিষয়টি নিয়ে খুব কম আলোচনা হয় কিন্তু সমস্যা অনেক বড়, সেটি হলো—ভ্যাট ও কর কর্তন। শিক্ষা উপকরণ কেনার সময় ভ্যাট দিতে হয়। এসএলআইপির বরাদ্দ থেকে আয়কর কাটা হয়। পরিবহন খরচ বিদ্যালয়ের। এই তিনটি মিলে প্রকৃত বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য অংশ শ্রেণিকক্ষে পৌঁছানোর আগেই উধাও হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে শিক্ষায় সরকারি বিনিয়োগকে কর থেকে মুক্ত রাখা একটি সাধারণ নীতি। ভারতে সর্বশিক্ষা অভিযানে, শ্রীলঙ্কায়, নেপালে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে কর অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কারণটা সরল—শিক্ষায় বিনিয়োগের ওপর কর বসানো মানে এক হাতে দিয়ে আরেক হাতে নেওয়া। বাংলাদেশে অন্তত এসএলআইপির বরাদ্দের ওপর ভ্যাট ও কর কর্তন পুনর্বিবেচনা করা দরকার। সমস্যাটা সহজেই সমাধানযোগ্য। কিন্তু এটা এত দিন মনোযোগের আড়ালে পড়ে আছে।

চার. সরকারের শিক্ষা সংস্কার আলোচনায় এখন একটি ধারণা বারবার আসছে—ফাউন্ডেশনাল লার্নিং বা মূলভিত্তিক সাক্ষরতা ও সংখ্যাজ্ঞান। সংক্ষেপে এফএলএন। জাতিসংঘের এসডিজি-৪ এবং ইউনেসকোর বৈশ্বিক শিক্ষা আলোচনায়ও এফএলএন কেন্দ্রস্থানে। মূল কথাটা সহজ—শিশু যদি প্রাথমিক শেষ করে পড়তে, লিখতে আর গুনতে না শেখে, তাহলে বাকি শিক্ষা দুর্বল ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এই ভিতটাকেই শক্ত করতে হবে।

কিন্তু এসএলআইপির বর্তমান কাঠামোয় এফএলএনের সঙ্গে সরাসরি যোগসূত্র নেই। শিক্ষা উপকরণ কেনা হয়, কিন্তু সেগুলো এফএলএনের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত কি না, তার কোনো পর্যবেক্ষণ নেই। বিদ্যালয় পরিকল্পনা জমা দেয়, কিন্তু সেই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর পড়া শেখার অগ্রগতি পরিমাপের কোনো সহজ সূচক নেই।

এই যোগসূত্রটা তৈরি করতে হবে। প্রতিটি এসএলআইপি পরিকল্পনায় তিন থেকে পাঁচটি সহজ সূচক যোগ করা যায় —কতজন শিক্ষার্থী দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণিতে স্বাচ্ছন্দ্যে পড়তে পারছে, উপস্থিতির হার কত, কতজন অনুপস্থিত থাকলে শিক্ষক বাড়িতে যোগাযোগ করছেন। এই সহজ সূচকগুলো এসএলআইপিকে একটি শেখার হাতিয়ারে পরিণত করতে পারে।

পাঁচ. বাংলাদেশে স্মার্টফোন এখন গ্রামেও সহজলভ্য। ইন্টারনেট পৌঁছেছে প্রত্যন্ত এলাকায়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইন্টিগ্রেটেড প্রাইমারি এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম তথা আইপিইএমআইএস তথ্যব্যবস্থায় স্কুলের অনেক তথ্য সংরক্ষিত হচ্ছে। এই পরিবেশে একটি এসএলআইপি ডিজিটাল ড্যাশবোর্ড তৈরি করা এখন আর কল্পনা নয়, বাস্তব সম্ভাবনা।

সেই ড্যাশবোর্ডে থাকতে পারে প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা, ব্যয়ের তথ্য ও উপস্থিতির হার। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ডিজিটালি অনুমোদন দিতে পারবেন। অভিভাবক মোবাইলে দেখতে পারবেন তাঁর সন্তানের স্কুলে কী হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারকেরা একটি ক্লিকে জানতে পারবেন কোথায় কেমন চলছে। রুয়ান্ডা এই কাজ করেছে। ভারতের ওডিশা ও মহারাষ্ট্র করেছে। বাংলাদেশের প্রযুক্তিসক্ষমতা আছে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটুকু দরকার।

ছয়. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি। প্রতিবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাসে শত শত স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাঠদান বন্ধ থাকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ। শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু এসএলআইপিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বরাদ্দ কমছে। জলবায়ু-সহনশীল শিক্ষা পরিবেশ তৈরির কোনো কাঠামোগত

বিধান নেই। সবুজ বিদ্যালয়ের কথা নীতি-দলিলে আছে, কিন্তু এসএলআইপির ব্যয় তালিকায় সেটা কার্যত অনুপস্থিত।

এটা একটা বড় ব্যবধান। পঞ্চম প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৫) প্রণয়নের সময় এই ব্যবধানটা পূরণ করার সুযোগ আছে। জলবায়ু-ঝুঁকিপ্রবণ বিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি বিশেষ বরাদ্দ রাখা দরকার। দুর্যোগ প্রস্তুতি ও সবুজ বিদ্যালয় উদ্যোগকে এসএলআইপির মূলধারায় আনা দরকার। বাংলাদেশের নিজের একটি অভিজ্ঞতা আছে—উপকূলে নির্মিত মাল্টিপারপাস সাইক্লোন শেল্টার-কাম-স্কুল মডেল। এই অভিজ্ঞতাকে এসএলআইপির পরিকল্পনায় যুক্ত করা যায়। দেশের জ্ঞান, দেশের সমস্যা, দেশের সমাধান।

সাত. শেষ করতে চাই চট্টগ্রামের সেই মেয়ের কথা দিয়ে। সে গল্পের বই চেয়েছিল। এটা অদ্ভুত কোনো চাওয়া নয়। পৃথিবীর যেকোনো দেশে একটি শিশু তার স্কুলে গল্পের বই চাইতে পারে। এটা তার অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশে নিয়ম বলছে, এই টাকায় এটা কেনা যাবে না। এই একটা ছোট গল্পে বড় একটা ব্যর্থতার ছবি আছে। আমরা বিদ্যালয়ে টাকা পাঠাচ্ছি, কিন্তু সেই টাকা শিশুর প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। এটা বদলাতে হবে।

এসএলআইপি সংস্কার শুধু একটি কর্মসূচির উন্নতি নয়। এটা লাখ লাখ শিশুর শিক্ষার গুণগত মান বদলানোর একটি সুনির্দিষ্ট পথ। এই পথে হাঁটার সাহস দেখাতে হবে সরকারকে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে দ্রুত। কারণ, শিক্ষার বছর থামে না, শিশু বড় হতে থাকে, সুযোগ চলে যেতে থাকে। পিইডিপি-৫ তৈরির এই মুহূর্তে শিক্ষার্থীর স্বার্থকে কেন্দ্রে রাখতে হবে। বাকি সব সিদ্ধান্ত তার চারপাশে সাজাতে হবে। এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

- **ড. হোসেন জিল্লুর রহমান** নির্বাহী চেয়ারম্যান, পিপিআরসি এবং সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

মতামত লেখকের নিজস্ব

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো